সমাবর্তন বক্তৃতা
সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি

স্বপ্ন, সাধনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা: আগামী দিনের পাথেয়

ড. রওনক জাহান
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

স্বপ্ন, সাধনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা:
আগামী দিনের পাথেয়

ড. রওনক জাহান
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজ-এর সভাপতি এবং সকল সদস্যবৃন্দ, এই বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য, আজকের সমাবর্তনের প্রধান অতিথি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বিশেষ অতিথি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, উপস্থিত সম্মানিত সুধী এবং স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষার্থীগণ এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

আজকের এই অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি গর্বিত। সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশে নারীশিক্ষার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। আমি জানতে পেরেছি যে, আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে দ্বিতীয়, কিন্তু বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের অধীনে প্রথম। ২০০২ সালের প্রথম সমাবর্তনের পর আজকের এই আয়োজনের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান ১৫ বছর, সে কারণেই আজকের দিনটি বিশেষ গৌরবের। সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি অতীতের নানা প্রতিকূলতা পার করে আজকের এই শুভলগ্নে উপনীত হয়েছে। আজকের দিনটা এই বিশ্ববিদ্যালয় তথা এর সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই সুন্দর সময়ের অংশ হতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত। অনেক সাধনা করে জীবনের একটি গুরত্বপূর্ণ ধাপ পাড়ি দেবার জন্য আমি সকল স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী ছাত্রীদের অভিনন্দন জানাই ।

যখন আমার নিজের শিক্ষাজীবনের দুটি সমাবর্তন-এর কথা মনে পড়ে তখন বেশ মিশ্র অনুভূতি জড়ো হয় মনের ভেতর। আমার জীবনের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ১৯৬৪ সালে, তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (অনার্স) এবং এম.এ. ডিগ্রি অর্জনের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু সমাবর্তন শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি কারণ শিক্ষার্থীরা চ্যান্সেলর অর্থাৎ সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনেম খান-এর সমাবর্তন যোগদানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল। চ্যান্সেলর এসে পৌছুলে তাকে বাঁচানোর জন্য পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে, এবং সেই সঙ্গে কিছু

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে। সমাবর্তন যে হয়নি তাতে আমাদের মন ততটা খারাপ হয়নি কারণ তখন স্বৈরশাসক আইয়ুব খান কর্তৃক নিয়োগকৃত মোনেম খান এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করাটাই যথাযথ বলে মনে হয়েছিল। তবে জীবনের দ্বিতীয় সমাবর্তনটি ছিল ঝামেলাহীন। ১৯৭০-এ যখন আমি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করি, আমার মনে পড়ে সেদিন নিজেকে একজন এভারেস্ট বিজয়ী মনে হয়েছিল। আমি বোধ করি, তোমরা আজ নিজেদের নিয়ে এমনটাই ভাবছো।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করা যেমন একদিকে উদ্‌যাপন করবার মতো ব্যাপার তেমনি এটি একাধারে খানিকটা দুশ্চিন্তারও, কারণ এখন পেশা নির্বাচন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা–উচ্চ শিক্ষায় যাবে, নাকি চাকুরী করবে, না সম্পূর্ণ সময় একজন গৃহিণী হয়ে থাকবে ইত্যাদি নানা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাবে। আজ থেকে প্রায় অর্ধশত বছর আগে আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করি, সে সময় নারীর জন্য পেশা বেছে নেবার সুযোগ অনেক কম ছিল। তখনকার দিনে আমাদের হয় শিক্ষক না হয় ডাক্তার যে কোনো একটা পেশা বেছে নিতে হতো। সেই সময়ে একজন নারী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারলেও তাদের জন্য প্রশাসন বা পররাষ্ট্র বিভাগে চাকুরির দ্বার খোলা ছিল না। কেবল মাত্র হিসাবরক্ষণ বিভাগ ও অডিট বিভাগের পদে নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পদচারণা ছিল না। যারা আইন নিয়ে পড়ালেখা করতেন, তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছাড়া আর অন্যকিছু করবার সুযোগ ছিল না। ঢাকা কোর্টে কোনো নারী প্রাকটিস করতেন না, বেসরকারি চাকুরিতেও নারীদের সুযোগ ছিল না। সাংবাদিকতা পেশায়ও পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।

বর্তমানে শ্রমবাজারে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন এমন কোনো পেশা নেই যেখানে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে না। এদেশের নারী আজ সরকারি প্রশাসন থেকে শুরু করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে কর্মরত আছে। তারা উড়োজাহাজের পাইলট থেকে শুরু করে রেলগাড়ির চালক পর্যন্ত হচ্ছে। ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন মেয়েদের কদাচিৎ রাস্তায় হাঁটতে দেখা যেত। এখন প্রতিদিন সাত সকালে বা সন্ধ্যায় রাস্তায় হাজার হাজার নারীকে হাটতে দেখা যায়। তারা সব শ্রমজীবী নারী - হয় গার্মেন্টস কর্মী অথবা বাসাবাড়িতে কাজ করে। আমার জীবদ্দশায় এ ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র দেখতে পারাকে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি।

আমি জানি, গত চার বছরে তোমাদের শিক্ষকদের অনেক উপদেশ শুনেছ। হয়তো আজকের এই আনন্দের দিনে তোমাদের আবারো উপদেশ শোনার মতো কোনো ইচ্ছা নেই। কিন্তু আমার কর্মজীবন যেহেতু মূলত শিক্ষকতার, তাই আমার জীবনলব্ধ কিছু শিক্ষা আজ তোমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই।

নারী হিসেবে জীবন থেকে যে প্রাথমিক শিক্ষা আমি পেয়েছিলাম তা হলো, নিজের একটা স্বপ্ন থাকা আর হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও সেই স্বপ্নের হালটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে অনেক সময়ই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ১৯৫০-এর দশকে আমি যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন ছোট শহরে স্কুলে পড়েছি, যেমন কুমিল্লা, বাগেরহাট, ভোলা, মুন্সিগঞ্জ, তখন আমার একটা বড় স্বপ্ন ছিল। আমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি থেকে ডিগ্রি অর্জন করতে চেয়েছিলাম। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি এই ভেবে যে, আমার বাবা-মা বিশেষত আমার বাবা, আমার এই স্বপ্নকে সমর্থন যুগিয়েছেন। আমি খুব ভালো করে জানতাম যে, আমার স্বপ্নের বাস্তবায়ন এর জন্য আমাকে ভালোভাবে পড়ালেখা করতে হবে, কারণ আমার বাবা-মা অর্থনৈতিকভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। আমি আমার স্বপ্নের পেছন অবিরত ছুটেছিলাম, আর তাই ফলস্বরূপ ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যাই। সেই সময় হার্ভাডে খুব কম মেয়েই লেখাপড়া করার সুযোগ পেত। মনে আছে, ঐ সময়ে প্রতি বছর হার্ভার্ড-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪০ জনের মতো ভর্তির সুযোগ পেত। এর মধ্যে বেশি হলে ৪ থেকে ৫ জন মেয়ে থাকত। তবে মেয়েদের বেশিরভাগই ডিগ্রি অর্জনে সক্ষম হতো না। ১৯৭০ সালে আমি সফলভাবে হার্ভাড থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করি। মনে হয় আমিই প্রথম বাঙালি নারী যে হার্ভাড থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করতে পেরেছি।

হার্ভার্ডে কাটানো চারটি বছর ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং। কারণ আমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সবচেয়ে ভালো ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল। চ্যালেঞ্জগুলো ছিল বহুমাত্রিক। জীবনে প্রথমবারের মতো ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস করতে হয়েছিল। এটি আমার জন্য কঠিন ছিল কারণ দেশে আমি বাংলা মাধ্যমে পড়েছি। হার্ভার্ডে আমাকে ক্লাসে কীভাবে কথা বলতে হয় তা শিখতে হয়েছিল যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সময়ে ক্লাসে মেয়েরা সাধারণত চুপ করে বসে থাকতো। সেখানে আমাকে শিখতে হয়েছিল কেবল মুখস্থ নয়, কীভাবে একটা বিষয়কে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করতে হয়। এসব নতুন নতুন বিষয় শেখা একদিকে যেমন ছিল

চ্যালেঞ্জিং অন্যদিকে তেমনি ছিল আনন্দদায়ক। এসব চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে গিয়ে আমি নিজের অনেক যোগ্যতা আবিষ্কার করেছি যা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই আগে ছিল না। আমি ক্রমশ আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠি। নানা বিষয় আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে ক্লাস ও ক্লাসের বাইরে একটি বন্ধুমহল গড়ে তুলেছিলাম আমি। আমার সেসব বন্ধুর অনেকেই আজ পৃথিবী বিখ্যাত। এতো বছর পর এখনও আমি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। হার্ভার্ডে কাটানো প্রতিযোগিতাপূর্ণ চারটি বছর আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। আজকের আমি যা তার পিছনে রয়েছে আমার হার্ভাডের শিক্ষার অভিজ্ঞতা।

হার্ভার্ডে যাওয়ার পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি শুনতে পাই; যে কথা দুটি আমার সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থেকেছে। প্রথমটি হলো 'স্কাই ইজ দ্য লিমিট' অর্থাৎ আকাশ হচ্ছে সীমানা। আমি এমন একটি সমাজে বেড়ে উঠেছি যেখানে আমাকে সবসময় শুনতে হয়েছে, মেয়েরা কী কী করতে পারে না। আমার আকাঙ্ক্ষা ও সুযোগের পথে সমাজ অনেকগুলো বাধা তৈরি করেছিল। তাই হার্ভার্ডে গিয়ে 'স্কাই ইজ দ্য লিমিট' শোনা মাত্রই তা মাথায় গেঁথে গেল। কথাটিকে অন্যভাবে বললে দাঁড়ায়, আমার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যতক্ষণ না আমার আকাঙ্ক্ষা অর্জন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে লেগে থাকতে হবে।

আরেকটি কথা যা হার্ভাডে শুনেছি – 'সিংক অর সুইম'– ডুব কিংবা সাতাঁর কাট – আমার জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। কথাটির অর্থ হলো তোমাকে অবশ্যই শিখতে হবে কীভাবে সাতাঁর কাটতে হবে, অন্যথায় তুমি ডুবে যাবে। তাই স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্তদের উদ্দেশে আমার উপদেশ: মনে রাখবে, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা হতে হবে আকাশসম। ভুলে গেলে চলবে না, জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো তোমাদের নিজেদের ভেতরকার শক্তি ও যোগ্যতাকে আবিষ্কার করার এক একটি সুযোগ।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় আমি শিখেছি এবং তা হলো যদি আমি আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চাই তবে আমাকে সমাজের আর দশজন কী ভাবছে তা নিয়ে বেশি চিন্তা করলে চলবে না। সমাজের বদ্ধমূল রীতিও বদলায় যখন সমাজ উপলব্ধি করে যে পরিবর্তনটা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক। যেমন ১৯৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে আমি প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করি। এবং ১৯৭৩ সালে চেয়ারপারসন হিসেবে বিভাগের দায়িত্ব নিই। কতই বা বয়স ছিল তখন আমার - খুব বেশি হলে তিরিশ। অন্যদিকে, অন্যান্য বিভাগের

চেয়ারপারসনদের মোটামুটি সবাই ছিলেন পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব। ঐ সময়ে সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র তিনজন নারী বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছিলেন। শুরুর দিকে খানিকটা বিস্ময় কাজ করছিল, কিছুটা সন্দেহও হচ্ছিল অনেকের এই ভেবে যে আমার মতো একজন অল্প বয়সী নারী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মতো একটি বড় বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্বসহ অন্যান্য কাজ ঠিকভাবে পালন করতে পারবে কি না! কিন্তু যখন একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংগুলোতে যোগ দিতে থাকলাম এবং অন্যান্য প্রশাসনিক মিটিংগুলোও স্বাভাবিকভাবেই হতে থাকল তখন মাস কয়েকের মধ্যে সবকিছুই একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে গেল। তাই স্নাতকদের উদ্দেশ্যে আমার দ্বিতীয় উপদেশ: সমাজের নিন্দুকেরা যেন তোমাদের স্বপ্ন পূরণের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। মনে রাখবে, তুমি যদি বাধা পেরোতে সক্ষম হও তবে তোমার দেখানো পথ অন্যরা অনুসরণ করবে। এভাবেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হবে। তখন তোমার প্রসংশা সবাই করবে এবং তুমি হবে রোল মডেল।

জীবনের তৃতীয় শিক্ষা আমি যা পেয়েছি তা হল সামাজিক কুসংস্কার ও বাধা পেরোতে হলে একজন নারীর জন্য তার পরিবার, শিক্ষক ও কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতনের সহযোগিতা পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমি ভাগ্যবান, আমার জীবনের নানা স্তরে আমি এ সকল সহযোগিতা পেয়েছি। এ-সকল সমর্থন, বিশেষ করে পুরুষদের সমর্থন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাধা পেরোতে আমাকে সাহায্য করেছে। আমার বাবাই প্রথম আমাকে ক্যারিয়ারের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি ছেলে-মেয়ের সমান অধিকারে বিশ্বাস করতেন। এম.এ পাশ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য যখন আমেরিকা যেতে চেয়েছিলাম এবং ঐ সময় বিয়ে করতে চাইনি, অথচ ঐ দিনগুলোতে লেখাপড়া শেষে বিয়ে করাটাই ছিল সামাজিক রীতি, আমার বাবাই আমার এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলেন। বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এমন সব শিক্ষক পেয়েছিলাম যাঁরা পুরুষ হলেও সবসময় আমাকে লেখাপড়ার উচ্চ শিখরে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু। তাঁরা আমাকে আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তাঁদের সাহচর্যে এসে নারী-পুরুষের তথাকথিত ব্যবধান আমি কখনও অনুধাবনই করিনি।

চতুর্থ বিষয়টি হল এই যে একজন নারী হিসেবে আমাকে আমার অধিকার বিষয়ে সোচ্চার থাকতে হবে। সেই সঙ্গে অধিকার রক্ষার দায়িত্বও আমার। আমাদের সংবিধানে সবার সমান অধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে সামাজিক অনেক প্রতিবন্ধকতা সম-অধিকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ প্রত্যাশা করে নারীর নিজের কোনো চাহিদা থাকবে না। হ্যাঁ, নারীরা তাদের সন্তান কিংবা

স্বামীর জন্য সমাজের কাছে চাহিদার কথা বলতে পারে, কিন্তু নিজের জন্য নয়। সমাজের আরো প্রত্যাশা–নারীরা সর্বদা প্রস্তুত থাকবে নিজেদের স্বার্থ, নিজেদের ভালো থাকাটাকে বিসর্জন দিতে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, উপার্জনের ক্ষমতা, এবং নিজের উপার্জন ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা অত্যন্ত জরুরি। এখন সময় ও পরিবার কাঠামোয় অনেক পরিবর্তন এসেছে। নারীরা আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর নির্ভর করে থাকতে পারবেনা। এমনকি বয়োবৃদ্ধকালেও নারীরা আর পরিবারের অন্যান্যদের উপর নির্ভরশীল হতে পারছেনা । এক্ষেত্রে তোমাদের জন্য আমার পরামর্শ: তোমাদের শিক্ষাকে উপার্জনের সুযোগ তৈরিতে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া নিজের উপার্জনের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পৃথিবীব্যাপী নানা গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক নারী তাদের উপার্জনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম নয়। অনেক সময় স্বামী কিংবা ভাই নারীর উপার্জনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

পঞ্চম একটি বিষয় আমি শিখেছি যে জীবনে সফল হতে হলে কেবল লেখাপড়াতেই ভালো হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রায়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পুরনো ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাদের প্রত্যেকেই যে লেখাপড়ায় ভালো ছিল তেমনটি নয়, কিন্তু তাদের অনেকেই ফুটবলার, ক্রিকেটার, অভিনয়শিল্পী, আইনজ্ঞ, শিল্পী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। অনেকে সাংসদ কিংবা মন্ত্রী হয়েছে। তাই আমার পরামর্শ–পরীক্ষায় খুব ভালো ফলাফল না হলে কখনই মন খারাপ করো না। কেবল ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার চেয়েও জীবনে অনেক কিছু করার আছে। তোমার মেধা হয়তো অন্য কোনো ক্ষেত্রে ভালো। তোমাকে সেটি আবিস্কার করতে হবে।

সবশেষে বলতে চাই, জীবনের কিছু সময় স্বেচ্ছা শ্রমে ব্যয় করবে। অবশ্যই মনে রাখবে অপরের ভালোর জন্য স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করার মতো এমন আনন্দ আর অন্য কিছুতে নেই। ক্যারিয়ার তৈরি করা, উপার্জন করা নিঃসন্দেহে আনন্দের, কিন্তু জীবনে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর কেবল ব্যক্তিগত অর্জনের জন্য কাজ করার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। এক পর্যায়ে যখন তুমি সমষ্টির উন্নয়ন বা সমাজের ভালোর জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে তখনই খুঁজে পাবে জীবনের সত্যিকার অর্থ। আমি পরম তৃপ্তি পেতে শুরু করি যখন শিক্ষকতা, গবেষণা, রাজনীতি বিষয়ক লেখালেখির পাশাপাশি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় নারী বিষয়ক লেখালেখি করতে শুরু করি। তাছাড়া আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারাটাও আমার জন্য হয়েছিল অত্যন্ত আত্মতৃপ্তির ব্যাপার।

পরিশেষে আবারো স্নাতকদের অভিনন্দন জানাতে চাই। আমি নিশ্চিত, অনেকেরই অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজকের এই গন্তব্যে পৌঁছুতে হয়েছে। জীবনের এই সফল দিনটিকে উপভোগ করো। মনে রেখো, আজকে যেসকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান তার অনেক কিছুই আমরা যখন পঞ্চাশ বছর আগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করি তখন ছিল না। কিন্তু নারীদের এখনও অনেক বাধা পেরোতে হবে। তবে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনো বাধাই অতিক্রম করা সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি, আজকের এই স্নাতকদের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে আগামী দিনের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কিংবা ইউজিসি চেয়ারম্যান বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারম্যান কিংবা ভবিষ্যত বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী এমনকি এ দেশের প্রধানমন্ত্রী। আমি তোমাদের সকলের উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করি।